Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 07 - 11
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 07 - 11
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সাম্প্রতিক সময়ে গীতার আলোকে যোগ ও সাম্য

শিখা সরকার শিকদার
সহকারী অধ্যাপিকা
সংস্কৃত বিভাগ, গলসি মহাবিদ্যালয়
Email ID: sikha.sarkar.sikdar2013@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Karmayoga, Jñānayoga, Bhaktiyoga, yajña, Equality, penance, sādhana, Śrīmadbhagavadgīt,

Abstract

Yoga is mainly the science of practice or application. And like any applied science, yoga is a guru-oriented science, although it can be said with certainty that yoga has been practiced since the Vedic period. The Atharva Veda talks about the basic meaning of the word yoga-

মূর্ধানমস্য সংসীপ্যাথর্বা হৃদয়ং চ যত্।
মস্তিষ্কাদূর্ধ্বঃ প্রেরয়ত্ পবমানোধি শীর্ষতঃ।।

(অথর্ববেদ সংহিতা, ১০.২.২৬)

That is, it is this Supreme Being that drives consciousness in all bodies like a warrior. The Supreme Being itself exists as the principal of the brain and heart. Apart from this, yoga is the stability of the senses according to the Katha Upanishad. The periodic words of yoga words mentioned in the Amarakoṣa are: convection, way, meditation, harmony and reasoning. The link says: যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ. That is, yoga is the way to inhibit or inhibit the instincts or actions of the mind. Habit is the care to keep the mind steady and persistent. On the other hand, non-attachment to worldly and supernatural things is Vairāgya. However, unable to control the instincts of the mind, the organism is always engaged in addictive work. In this way, the living being is once on the path of death while doing addictive work. In such a situation, the doubt of whether one should leave karma can arise in all of us. In this context, the Śrīmadbhagavadgītā describes the philosophy of welfare and equality through the renunciation of karma through the work of the scriptures.

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিত্সয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োSন্যোSস্তি কুত্রচিত্॥"

Therefore, the philosophy of equality is achieved through the three types of sādhana – Karmayoga, Jñānayoga and Bhaktiyoga. And it is also possible to achieve the ultimate goal of life only if there is a philosophy of equality.

Discussion

যোগ হল প্রধানত সাধনশাস্ত্র বা প্রয়োগবিদ্যা। আর যেকোনো প্রয়োগবিদ্যার মতই যোগও গুরুমুখী বিদ্যা। যদিও একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, বৈদিক যুগ থেকেই যোগের প্রচলন ছিল। অথর্ব বেদে যোগ শব্দের মৌলিক অর্থ বিষয়ে বলা হয়েছে,

"মূর্ধানমস্য সংসীপ্যাথর্বা হৃদয়ং চ যত্।
মস্তিষ্কাদূর্ধ্বঃ প্রেরয়ত্ পবমানোধি শীর্ষতঃ।।"[১]

অর্থাৎ এই পরমাত্মাই সকল দেহে চেতনাকে কারীগরের মতো চালনা করছে। পরমাত্মাই স্বয়ং মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের অধ্যক্ষরূপে বিদ্যমান। এছাড়া কঠোপনিষদনুসারে ইন্দ্রিয়গুলির স্থিরভাব অবলম্বনই হল যোগ।[২] অমরকোষে উল্লিখিত যোগ শব্দের পর্যায়বাচী শব্দগুলি হল - সংহনন, উপায়, ধ্যান, সংগতি এবং যুক্তি।[৩] যোগসূত্রে বলা হয়েছে, 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'।[৪] অর্থাত্ চিত্তের বৃত্তি বা ক্রিয়াগুলিকে নিরোধ বা নিরোধের উপায়ই হল যোগ। এই যোগ সাধনের জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্য আবশ্যক। চিত্তকে স্থির ও অবিচল করে রাখার প্রযত্নই হল অভ্যাস। অন্যদিকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়াদির প্রতি বিরাগই হল বৈরাগ্য। তবে চিত্তের বৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করতে না পেরে জীব সর্বদাই আসক্তিপূর্বক কর্মে নিযুক্ত হতে থাকে। এইভাবে আসক্তিপূর্বক কর্ম করতে করতে জীব একসময় মৃত্যুর পথে ধাবিত হয়। এমতাবস্থায় তবে কি কর্ম ত্যাগ করা উচিত? - এই সংশয় আমাদের সকলের মনে জাগরিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শাস্ত্রবিহিত কার্যসাধনের মাধ্যমে কর্মাসক্তি ত্যাগের দ্বারা কল্যাণসাধন এবং সাম্যদর্শনের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাত্ যোগের অনুষ্ঠানের দ্বারাই সমতা বা ঐক্যসাধন সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিত্সয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োSন্যোSস্তি কুত্রচিত্॥" শ্রীমদ্ভাগবত্, 11।20। 6

অতএব কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ – এই তিন প্রকার সাধনার দ্বারাই সাম্যদর্শন হয়। আর সাম্যদর্শন হলেই জীবনের পরমলক্ষ্য প্রাপ্তিও সম্ভব। যাইহোক এখন মূল বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করার প্রয়াস করা যাক। বেদের পূর্বভাগ হল কর্মকাণ্ড এবং উত্তর ভাগ হল জ্ঞানকাণ্ড। তবে কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড - এই উভয়েরই সমন্বয় দৃষ্ট হয় উপাসনাতে। সুতরাং কর্ম ও জ্ঞান উভয়ই পরস্পর ভিন্ন হলেও উভয়ই হল একে অপরের অঙ্গস্বরূপ। অন্যদিকে ভক্তি হল উভয়েরই সমন্বয় সাধিকারূপ। যেহেতু কর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানের দ্বারা কৈবল্য ও জ্ঞাননিরপেক্ষ কর্ম দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, সেহেতু জ্ঞানহীন কর্ম এবং কর্মহীন জ্ঞান কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

কর্মযোগের তাৎপর্যগত অর্থ হল - দেহাদির দ্বারা কর্ম করেও পরমাত্মার প্রাপ্তি। 'কর্মযোগ' শব্দটি প্রধানত 'কর্ম' এবং 'যোগ' – এই শব্দদুটি দিয়ে গঠিত। 'কর্ম' শব্দটির দ্বারা শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মকে বোঝায়। অন্যদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'যোগ' শব্দটিকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, ঐক্য বা সমতাদর্শনই হল যোগ – 'সমত্বং যোগ উচ্যতে' (গীতা, 2। 48) এবং দ্বিতীয়ত, দুঃখসংযোগের বিয়োগকেও যোগ বলে - 'তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্' (গীতা, 6। 23)। এছাড়াও সমতা বা ঐক্য বিষয়ে বলা হয়েছে যে, 'নির্দোষং হি সমঃ ব্রহ্ম'। অর্থাৎ ঐক্য বা সমতা দ্বারাই পরমাত্মার প্রাপ্তি ঘটে অথবা পরমাত্মাতে সমত্বদর্শনই হল যোগ। সুতরাং কর্মযোগে যোগ - এরই প্রাধান্য বিদ্যমান, কর্মের নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' (গীতা, 2। 50)। অর্থাত্ যোগ হল কর্মের কৌশল। কর্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের মার্গ হল যোগ। তবে কর্মতত্ত্বকে সঠিকভাবে জানতে হলে কর্মের বর্গীকরণগুলিকেও জানতে হবে। ভিন্নভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কর্মের বিভাগগুলি হল -

১. সাধনগত দৃষ্টি থেকে - কায়িক, বাচিক এবং মানসিক।
২. ধর্মশাস্ত্রগত দৃষ্টি থেকে - সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক।
৩. হেতুগত দৃষ্টি থেকে - নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য।
৪. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে - কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম।
৫. বৈদান্তিক দৃষ্টি থেকে - প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মান।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পর্যালোচনার দ্বারা ধর্ম, অধর্ম, কর্ম, অকর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি তত্ত্বগুলি সহযোগে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কৌশল সম্বন্ধেও অবগত হওয়া যায়। তবে যোগশাস্ত্ররূপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নামকরণ স্বার্থক। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের প্রতি এটি গীত বা উক্ত হয়েছে। শ্রীমদ্ শব্দের অর্থ হল, সুন্দর এবং ভগবদ্ শব্দের অর্থ হল, ভগবানের বা ঈশ্বরের। অন্যদিকে গীত শব্দ থেকে এসেছে গীতা। সুতরাং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শব্দটির অর্থ হল - ঈশ্বরের বা ভগবানের সুন্দর গীত বা বচন। পুনরায় গীতার যোগশাস্ত্র নামকরণও স্বার্থক। কারণ যোগ হল প্রধানত সাধনশাস্ত্র বা প্রয়োগবিদ্যা। আর ভারতবর্ষ হল অন্যান্য সকল দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশ। এখানে শাস্ত্রকে কেবলমাত্র অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে কিভাবে আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় সেই কৌশল লক্ষ্য করা যায়। অর্থাত্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল এমন একটি শাস্ত্র যাকে আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে আমাদের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র সুন্দর হয়ে উঠবে।

ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভের প্রসঙ্গ আসতেই আমাদের সকলের মনে তপস্যা বা সন্ন্যাসের বিষয়টি উদয় হয়। তবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারে সন্ন্যাস হল কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হওয়া। তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাস বা কর্মযোগকেই ভগবদপ্রাপ্তি বিষয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন।[৫] সুতরাং গীতোক্ত উপদেশের দ্বারা আমাদের ব্যাবহারিক জীবনেও আমরা কর্মের মাধ্যমে পরমেশ্বর বা পরব্রহ্মকে লাভ করতে পারি। এখানে কর্ম হল যজ্ঞ স্বরূপ। সকল প্রকার আসক্তিশূন্য হয়ে এই যজ্ঞ বা কর্ম করতে হবে। ঈশ্বরকে এই যজ্ঞের ফল নিবেদন করলেই আসক্তিশূন্য হওয়া যায়। ফলে সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহচর্য ও আদান-প্রদানও বৃদ্ধি পায়। এই উপদেশের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমাজের সকল মানুষ যদি অন্যের উদ্বেগের কারণ না হন, নিজের ইষ্টলাভে সন্তুষ্ট এবং অন্যের ইষ্টলাভে অসহিষ্ণু না হন, তবে সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হতে পারেন। তাহলে সমাজও সকলপ্রকার কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে সকলের বাসযোগ্য উত্তমভূমি হয়ে উঠবে। এইভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত কর্মযোগের অনুসরণ করলে মানুষ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির পদবীতে সমুন্নত হতে পারবে। আর কর্মযোগ তখনই স্বার্থক হবে যখন কর্মের সঙ্গে পরমাত্মার যোগ সিদ্ধ হবে। এই কর্মযোগে ভক্তির সংমিশ্রণই হল গীতার বিশেষত্ব। এক কথায় ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্মই হল গীতোক্ত কর্মযোগ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম বা চাতুর্বর্ণ্যপ্রথা বহুদিন পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ সেখানে তিনি মানুষের গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চাতুর্বর্ণ্যের বিভাগ করেছেন।[৬] তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত বর্ণবিভাগের অনুসরণের মাধ্যমেও সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হতে পারে। অতএব বলা যায় যে, গার্হস্থ্যজীবনে নিজেকে ফলন্ত ও বিকশিত করে, বাণপ্রস্থের আহ্বানে জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানশক্তি লোককল্যাণার্থে সঞ্চারিত করে ব্রহ্মানুভূতি অর্জনই হল মানুষের আদর্শ জীবননীতি। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ভোগ বা প্রবৃত্তির পথে ক্রমবিকাশের দ্বারা সকল মানুষকে ভগবত্ সান্নিধ্যে উপনীত করাই হল আশ্রমধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। এই একই উদ্দেশ্যে বর্ণচতুষ্টয়ের গুণগত স্বধর্মও নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হিংসা প্রবৃত্তি থেকে মুক্তির উপায়রূপে সাম্যতত্ত্ব বা ঐক্যতত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানযোগের আলোচনা প্রসঙ্গে মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি বিষয়গুলিও বর্ণনা করেছেন।[৭] অন্যদিকে ঈশ্বর স্বয়ং জীব ও জগদ্রূপ ধারণ করে সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবিষ্ঠ হয়ে আছেন[৮] - এই জ্ঞানের দ্বারাও অহিংসাভাব প্রতিষ্ঠা হতে পারে। অতএব ভগবানের আজ্ঞানুসারে ফল, আসক্তি ও অহংকারকে পরিত্যাগপূর্বক পরমেশ্বরে সকল কর্তব্যকর্মের সমর্পণই হল কর্মযোগ।

কেবলমাত্র যে কর্মযোগের দ্বারা ঐক্যদর্শন বা সাম্যভাব হয় তা নয়, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগও এই বিষয়ে সমান গুরুত্বপূর্ণ। কর্মের দ্বারাই বাসনা ওবং বাসনা থেকে আবার কর্মের উদ্যোগ। এই ভাবে অনাদি কাল থেকেই কর্মের চক্র প্রচলিত হয়ে আছে। তবে এই কর্ম থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়রূপে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাত্ কুরুতের্জুন।[৯] অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা সকল কর্ম ভস্মীভূত হলে মুক্তি লাভ হয়। জ্ঞানযোগের দ্বারা সাম্য প্রতিষ্ঠার উপায়রূপে বলা হয়েছে, মানুষকে জগৎসংসারে দিব্য অধ্যাত্মজীবনের বিকাশ করতে হবে এবং দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে যা কিছু অন্যায় ও অসত্য তা নির্মূল করে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[১০] কর্মযোগের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি ও অভ্যাসযোগের মাধ্যমে মন নিরুদ্ধ হওয়ায় বুদ্ধি শান্ত ও শুদ্ধ হলে কোনো ব্যক্তি জ্ঞান লাভের যোগ্য হয়। শমদমাদিবিশিষ্ট

ব্যক্তির আচার্যের নিকট তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণানন্তর মনন হয়, যাকে বলা হয় স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'সর্বভূতহিতে রতাঃ' (গীতা, 12। 4) এবং ভক্তিযোগ বিষয়ে বলেছেন, 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণঃ এব চ' (গীতা, 12। 13)। এইভাবে জ্ঞানযোগের দ্বারা সকল প্রাণীর কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে এবং ভক্তিযোগের দ্বারা সকলের প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রকাশের ফলে ঐক্য বা সমতাদর্শন হলে একটি সুন্দর রাষ্ট্র গঠিত হবে। এই সমত্বদর্শনের ফলে মানবজীবনের গুণগত মানবৃদ্ধির দ্বারাই সমাজ থেকে যুদ্ধ, হিংসা, অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হতে পারে। গীতোক্ত যোগ থেকেই জীবনদর্শন ও আধ্যাত্মিক সাধনের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এইভাবে একই সাথে জাগতিক কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানই হল গীতালোকে যোগ বা সাম্যতত্ত্বের মূল বিষয়।

জীবনে পরমোৎকৃষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ - এই তিন প্রকার সাধন শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। বেদের পূর্বভাগ হল কর্মকাণ্ড এবং উত্তরভাগ হল জ্ঞানকাণ্ড। অন্যদিকে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড - এই উভয়ের সমন্বয় দেখা যায় উপাসনাতে। এইভাবে জ্ঞান ও কর্ম একে অপরের থেকে ভিন্ন হলেও পরস্পর পরস্পরের অঙ্গস্বরূপ; কারণ ভক্তি হল এই উভয়ের সমন্বয়সাধিকা। সুতরাং জ্ঞানহীন কর্ম বা কর্মহীন জ্ঞান কখনও সম্ভব নয়। যদি কর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান কৈবল্যের দিকে উন্মুখ হয় তাহলে জ্ঞাননিরপেক্ষ কর্ম স্বর্গপ্রাপ্তির মাধ্যম হয়।

ভারতবর্ষের মহান শাস্ত্রগুলির মধ্যে গীতা হল অত্যন্ত প্রামাণিক একটি গ্রন্থ, যা ধার্মিক চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থের মূল শিক্ষা হল - এটি এক জাতি ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও নবজাগরণের ক্ষেত্রে একটি নির্মাণকারী শক্তিস্বরূপ। তাছাড়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল একটি পরম রহস্যময়ী গ্রন্থ। একে সম্পূর্ণ বেদের সারগ্রন্থও বলা হয়ে থাকে। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মানুষকে উদ্ধার করা। গীতার বাণী বিশ্বজনীন, বাস্তবমুখী, শক্তিদায়ী এবং পবিত্রকারী। মানবসম্পদের এবং মানবিক সম্ভাবনার যে অসামান্য বিজ্ঞান উপনিষদগুলিতে বর্ণিত হয়েছে গীতায় তা বাস্তবরূপে, প্রয়োগমুখী তাৎপর্যরূপে এবং লক্ষ্যনির্দেশরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাছাড়া এখানে ঔপনিষদিক দর্শনের বাস্তববাদী তাৎপর্যকে মানুষের সমস্যা সমাধানের উপায়রূপে প্রয়োগ করার প্রযত্ন দেখা যায়। যারা কর্মব্যস্ত মানুষ তাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই গ্রন্থে মৌলিক জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের জ্ঞানের দ্বারা সমগ্র জাতি যদি অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে তাহলে আমাদের জাতীয় জীবনে বিবিধ ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি আসবে।[১১] অতএব জ্ঞানানুসন্ধান হল তপস্যাস্বরূপ। তাছাড়া মানুষের কল্যাণের জন্য কর্ম ও ধ্যানের প্রয়োজনয়। কর্ম বা প্রবৃত্তির দ্বারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের দ্বারা একটি জনকল্যাণমুখী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু ধ্যান বা নিবৃত্তির দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে মূল্যবোধমুখী জীবন গড়ে তোলা সম্ভব। অতএব মানুষের মঙ্গলের জন্য ধ্যান ও কর্ম উভয়েরই প্রয়োজন।

বৈদিক ধর্মের প্রাথমিক স্বরূপ কর্মপ্রধানই ছিল। ঔপনিষদিক যুগে তা জ্ঞানপ্রধান হয়ে ওঠে এবং পরে পৌরাণিক যুগে তা ভক্তিপ্রধান হয়ে ওঠে।

অনেক জায়গায় স্পষ্টতই ধর্মশাস্ত্রকারগণ জ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের সমুচ্চয়ই উপদেশ করেছেন। যথা -

"তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়াऽমৃতমশ্নুতে।।"[১২]

বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠান ও জ্ঞান উভয়ই মোক্ষপ্রদ। কর্মের দ্বারা দোষ নষ্ট হয়ে জ্ঞানের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়।[১৩] আত্মজ্ঞান ছাড়া আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান দুর হয় না। এই জন্যই গীতাতে কর্মোপদেশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞানের উপদেশও আছে। এক্ষেত্রে গীতা সম্পূর্ণ উপনিষদের অমুবর্তন করেছে এবং অনেক স্থলে উপনিষদের ভাষাও ব্যবহার করেছে। কিন্তু জ্ঞানলাভ করেও কর্মসন্ন্যাস না করে অনাসক্ত ভাবে লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করাই কর্তব্য - এই নিশ্চিত মতই হল গীতার জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয়বাদ।

অধ্যাত্মতত্ত্বের বিচারে গীতায় তিন পুরুষ ও দুই প্রকৃতির উল্লেখের দ্বারাই নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ, নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব ও সগুণ ঈশ্বরবাদ বা ভগবত্তত্ত্বের সমন্বয় হয়েছে। সেই সমন্বয়মূলক দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিমিশ্র অপূর্ব যোগ শিক্ষা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে।

জীবের যখন নানাত্ব বুদ্ধি বিদূরিত হয়ে একত্ব জ্ঞান হয় তখন জীব শম, শান্ত, নির্মল হয়ে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। সেই সময় জীবের কোনো কর্ম থাকে না। কিন্তু তখন তার কর্ম ঈশ্বরের কর্ম হয়ে যায়। এক্ষেত্রে জীব হল নিমিত্তমাত্র। অনন্তর ঈশ্বরের প্রতি জীবের পরাভক্তি জন্মে। এমতাবস্থায় জীব অনাসক্ত, ফলাফলে উদাসীন, নির্দ্বন্দ্ব ও সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে বিশ্বকর্ম করতে পারে।[১৪] এই কর্মের দ্বারা কোনো বন্ধন হয় না এবং জ্ঞানের সঙ্গেও কোনো বিরোধ হয় না।

আমরা জানি জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বা মায়ার বিনাশ হলে মোক্ষলাভ হয়। মোক্ষ বিষয়ে জীবের আত্মস্বাতন্ত্র্য আছে। জীব সদ্গুরুর আশ্রয়ে আত্মপ্রযত্নে বা আত্মসংস্থযোগ বা আত্মানাত্মবিবেকবিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। এটিই হল জ্ঞানমার্গ।

উপাসনা ভক্তিমার্গের সাধনা, শ্রবণ-মননাদি জ্ঞানমার্গের, প্রাণায়ামাদি যোগমার্গের এবং ত্যাগ হল সকল মার্গেরই সাধনা। ত্যাগ ছাড়া জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ - কোনো পথেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কারণ ত্যাগ হল সকল সাধনার মূল। সেইজন্য গীতাতে সর্বত্রই ত্যাগানুশীলনের উপদেশ রয়েছে। তবে সেখানে ত্যাগ শব্দের অর্থ কর্মত্যাগ নয়, কামনা ত্যাগ বা কর্মফল ত্যাগকে বোঝানো হয়।[১৫] অন্যদিকে দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের বর্ণনা প্রসঙ্গেও পূজার্চনা-ধ্যানাদি অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়েছে। আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত জ্ঞানের সাধনার মূল কথাও ত্যাগ।

কর্ম ভগবানেরই সৃষ্টি। ভগবানের দ্বারাই জীবের কর্মে প্রবৃত্তি হয়। এটি হল ঈশ্বরের লীলা। গীতা অনুসারে লোকসংগ্রহার্থ জীবের কর্ম করতে হয়। এই স্বধর্মপালনরূপ ভগবদর্চনা দ্বারাই জীব সিদ্ধিলাভ করতে পারে।[১৬] গীতা কোনো সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মগ্রন্থ নয়, এটি মানবধর্মগ্রন্থ। গীতায় সার্বভৌম ধর্মোপদেশ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই তা গ্রহণ করতে পারেন। গীতার সেই উপদেশের অনুবর্তী হয়ে কিভাবে স্বকীয় ধর্মজীবন ও কর্মজীবন নিয়মিত যাপন করলে সকলেই ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করতে পারেন।

Reference:

১. অথর্ববেদ সংহিতা, ১০.২.২৬

২. তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্, অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগোহি প্রভবাব্যয়ৌ, কঠোপনিষদ্, ৬. ১১

৩. যোগঃ সংহননোপায়ধ্যানসংগতিযুক্তিষু, অমরকোষ, নানার্থবর্গ, ২২

৪. যোগসূত্র, ১. ২

৫. গীতা, ১২. ২

৬. গীতা, ৪. ১৩

৭. গীতা, ১২. ১৩

৮. গীতা, ১০. ৮

৯. গীতা, ২. ৫০

১০. গীতা, ১১. ৩৩

১১. বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতা, বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতা, গীতা, ৪.১০

১২. মনুসংহিতা, ১২. ১০৪

১৩. মনুসংহিতা, ১১. ২৩৬

১৪. গীতা, ১৪. ২২-২৩

১৫. গীতা, ১৮. ১১

১৬. গীতা, ১৮. ৪৬